পাঞ্জেরী

ফররুখ আহমদ

কবি পরিচিতি

বিশ শতকের শুরু থেকে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশের সূচনাপর্ব বলা যেতে পারে। সাহিত্য সাধনায় এ পর্বের অনেক মুসলমান কবি সাহিত্যিক মুসলিম পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফররুখ আহমদ সেই কালপর্বের একজন খ্যাতনামা কবি হিসাবে পরিচিত। কাব্যচর্চার বৈচিত্র্য ও কবি ভাবনার মৌলিকত্বে কবি ফররুখ আহমদ সমধিক খ্যাত।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মাগুরা জেলায় ফররুখ আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর কাব্যে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সংগে আরবি, ফার্সি ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর পরিচিত কাব্য গ্রন্থের নাম "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজুম মুনীরা", "মুহূর্তের কবিতা"। ''নৌফেল ও হাতেম" নামে তিনি একটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। এছাড়া, তিনি শিশুদের জন্য কবিতা রচনা করেছেন।

১৯৭৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান ভাবকল্পনা এক সূত্রে গ্রথিত করে 'পাঞ্জেরী' কবিতার রূপকল্প কবি অংকন করেছেন। কবি এখানে প্রতীকের মাধ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরণের আবেদন প্রকাশ করেছেন। মুসলমানরা উত্তাল সাগরের বুকে এক সময় দুঃসাহসী অভিযাত্রী হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু আজ তারা সেই ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত। গৌরবহীন দিনযাপন আজ তার নিত্য সঙ্গী। মুসলমানদের জীবন থেকে এ গ্লানিময় দিনযাপনের অবসানকল্পে কবি চিত্ত ব্যাকুল। দিগন্ত বিস্তারী সমুদ্র বক্ষে দিগভ্রান্ত নাবিক নব প্রভাতের আলোর প্রত্যাশায় কবি অধীর আগ্রহে দিন গুনছেন। মুসলিম জাতি সত্যভ্রষ্ট, পথভ্রান্ত। জীবন সমুদ্রের অনির্দেশ্য পথের ঠিকানা আজ অজানা। সম্মুখে কুয়াশাচ্ছন্ন দিগভ্রান্ত গন্তব্য। কবির প্রত্যাশা মুসলিম জাতি মহাজাগরণের বীজ মন্ত্রে আবার জেগে উঠবে, পাঞ্জেরী যেন সেই নবজাগরণের প্রত্যাশায় দীপ্ত আলোর দিশারী।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. ফররুখ আহমদের কাব্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পাঞ্জেরী শব্দের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত শব্দের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মর্মবেদনার কথা লিখতে পারবেন।

	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
পাঞ্জেরী – আলোকবর্তিকা। সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলের সংগে পথ চিনে চলার জন্য যে আলোক বর্তিকা ঝুলানো থাকে। **সেতারা** – তারকা হেলাল – চাঁদ **দীঘল** – দীর্ঘ **জয়ভেরী** – আনন্দ ডংকা **খাব** – স্বপ্ন **দরিয়া** – নদী।	রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে? তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে; অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি। রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী? দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে? এ কী ঘন-সিয়া জিন্দেগানীর বা'ব তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব, অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী। তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

ভাবসংক্ষেপ

দুঃখের রজনী বড় দীর্ঘ। ক্লান্ত নাবিক দিগভ্রান্ত সমুদ্রের নিরন্তর দাঁড় বেয়ে চলেছে। অন্ধকার রাতে আলোর নিশানা নেই। অসীম তমসার মাঝে যেন অন্তহীন পথ চলা। জীবনের সকল আনন্দ মুছে গেছে। কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে আশার আলো নিভে গেছে। জীবনের এ অসীম অন্ধকার থেকে বুঝি মুক্তির পথ রুদ্ধ। শুধু অনির্দিষ্ট পথের খোঁজে দুঃখের রাতে সমুদ্র পাড়ি দেয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী' ছত্রটির মর্মার্থ লিখুন।
২. সমুদ্রে দিগভ্রান্ত নাবিকদের দুর্দশার কথা নিজের ভাষায় লিখুন।
৩. এ দুইটি স্তবকে কবির মর্ম বেদনা প্রকাশের কারণ কী?

প্রশ্ন : 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী' ছত্রটির মর্মার্থ লিখুন।

উত্তর : পাঞ্জেরী শব্দের অর্থ আলোকবর্তিকা। পরাধীন মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের মাধ্যমে স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য কবি অহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্ন : সমুদ্রে দিগভ্রান্ত নাবিকদের দুর্দশার কথা নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : দুর্দশাগ্রস্ত, পরাধীন মুসলিম জাতির মর্মবেদনার কথা কবি এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সঠিক পথের অভাবে মুসলমানরা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। অতীত ঐতিহ্য আজ বিলুপ্ত। অন্ধকার পথ থেকে মুক্তির দিশারী হিসাবে পাঞ্জেরীকে কবি প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? ..... অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

আলোচ্য কবিতাংশটি ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে কবি রূপকের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রামরত নেতৃবৃন্দের কাছে মুসলমানদের ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের অহ্বান জানিয়েছেন।

দুঃখ ভারাক্রান্ত মুসলিমগণ আজ দিগভ্রান্ত। মুক্তির চেতনায় মুসলমান সমাজ আজ উদ্‌গ্রীব। অস্তমিত স্বাধীনতা মনে হয় সুদূর পরাহত। তাই, পাঞ্জেরী অর্থাৎ জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পরাধীনতার অনামিসা কাটিয়ে ওঠার জন্য কবি আবেদন জানিয়েছেন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পরাধীন জাতির দুঃসহ অপেক্ষার কথা লিখতে পারবেন।
- স্বাধীনতার চেতনায় উন্মুখ মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভ্রান্ত জাতির মাশুল পরাধীনতা কবি বর্ণিত এ কথাটি নিজের কথায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
পেরেশান – ক্লান্ত **সোঁতায়** – স্রোত **জুলমাত** – অত্যাচার **আহাজারী** – কান্না **মুসাফির** – পথিক **অথই** – যার কূল নেই **শশী** – চাঁদ **শর্বরী** – রাত **মজলুম** – অত্যাচারিত **অগনন** – অসংখ্য।	রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী? বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে, বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে, বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে। আহা, পেরেশান মুসাফির দল দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে নিরাশার ছবি এঁকে! পথহারা এ দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে চলেছি কোথায়? কোন্ সীমাহীন দূরে? তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; একাকী রাতের্‌ান জুলমাত হেরি। রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী? শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে, দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে, আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি' দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী। মোদের খেলার ধূলায় লুটায়ে পড়ি'

	কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী। সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী, ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুন্‌ছি তারি। ওকি বাতাসের হাহাকার, –ওকি রোনাজারি ক্ষুধিতের! ও কি দরিয়ার গর্জন, – ওকি বেদনা মজলুমের! ও কি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী। পাঞ্জেরী! জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি :

ভাবসংক্ষেপ

স্বাধীনতাকামী জনগণ প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। কবে পরাধীনতার অন্ধকার দূর হয়ে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হবে। পরাধীন জাতি দিকভ্রান্ত। পরাধীনতার মর্মজ্বালা বড় বেশি পীড়াদায়ক। দুঃখ ভারাক্রান্ত, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত জাতি সংগ্রামরত নেতৃত্বের অগ্রনায়কদের আশার বাণী শোনার অপেক্ষায় থাকে। স্বাধীনতার প্রতীক পাঞ্জেরীর পথ চেয়ে উন্মুখ স্বাধীনতাকামী যাত্রীগণ বন্দরে প্রতীক্ষমান; কিন্তু প্রত্যাশিত স্বাধীনতার জাহাজ কূলে ভেড়ে না। নৈরাশ্যের আঁধারে নিমজ্জমান যাত্রীদের নিকট পাঞ্জেরী বুঝি সহসা আসেনা। হতাশা আর ক্লান্তি প্রহর গুণে দিন বয়ে যায়।
এককালের ঐহিত্যময় ও সমৃদ্ধশালী জাতি আপনার ভুলে স্বাধীনতার যে গৌরব আজ হারিয়েছে তাকে পুনরুদ্ধার করা বড় সুদূর প্রসারী মনে হয়। অস্তমিত সেই সৌভাগ্যের দিন আজ অত্যাচারিতের আহাজারিতে ভরা। ক্ষুধিত মানুষের কান্নায় চারিদিকে শুধু হাহাকার। তবু ও দৃঢ়তার প্রত্যয়ে আগামীর স্বাধীনতা সূর্যের উদয়ে কবি নিশ্চিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২. দরিয়া অথই ভ্রান্তির অর্থ কী?
৩. 'চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী? সূর্য ওঠা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৪. 'পাঞ্জেরী' কবিতায় কোন যাত্রাপথের কথা বলা হয়েছে?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : 'বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : বন্দর বলতে আমরা সমুদ্র বা নদী তীরবর্তী ব্যবসা কেন্দ্র বুঝি। কিন্তু এক্ষেত্রে, কবি বন্দর সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। স্বাধীনতার জন্য নেতৃবৃন্দ সংগ্রামরত। স্বাধীনতা প্রত্যাশী উন্মুখ জনগণ প্রতীক্ষা করছে। সারা দেশের প্রতীক্ষারত জনগণকে যাত্রী এবং দেশকে বন্দর হিসাবে প্রতীকের মাধ্যমে কবি প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন : দরিয়া অথই ভ্রান্তির অর্থ কী?

উত্তর : পাঞ্জেরী কবিতায় পরাধীনতাকে অন্ধকারের সংগে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পরাধীন জাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন তমসায় পতিত। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতাকে কবি আলো বা সুর্যের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পরাধীনতার অন্ধকার বিদূরিত করে স্বাধীনতার সূর্য জাতির জীবনকে কখন আলোকিত করবে সেই প্রশ্নই কবি এখানে করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক. শুধু গাফলতে শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে
..... গিয়াছে তাদের সেতারা শশী।

খ. পথ হারা এই
..... কোন সীমাহীন দূরে?

গ. মোদের খেলা ধূলায় ফুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ-শর্বরী।

খ. পথ হারা এই
..... কোন সীমাহীন দূরে?

আলোচ্য অংশটি কবি ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।
পরাধীনতার শিকল পরা জাতীয় জীবনে সংকটের কথা কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন।

নিঃসীম সাগরের বুকে আঁধার রাতে চলমান জাহাজ পথ হারিয়ে ফেলেছে। দিগ্‌ভ্রান্ত জাহাজ হয়ত অপ্রত্যাশিত গন্তব্যে উপনীত হবে। মুসলমান জাতি ও আজ এমনিভাবে পথ হারিয়ে ফেলেছে। পরিত্রাণের পথ জানা নাই গন্তব্যের নিশানা ও অজানা। এ দুঃসহ মর্মপীড়িত জাতিকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে কবি পাঞ্জেরীকে প্রতীক হিসাবে কল্পনা করেছেন। প্রকৃত নেতৃত্বের ভুলে জাতি আজ দিশাহারা দিগ্‌ভ্রান্ত। জাতীয় জীবনের এ দুর্ভোগ ও দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের পথ তাদের অজানা। নিরাশার হতাশায় নিমজ্জমান মুসলমান জাতিকে বুঝি পথ দেখাবার কেউ নেই।

ক. **শুধু গাফলতে শুধু খেয়ালের ভুলে,**
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে
..... গিয়াছে তাদের সেতারা শশী।

কবি ফররুখ আহমদ রচিত 'পাঞ্জেরী' কবিতা থেকে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। কবি এখানে সঠিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনার অভাবে স্বাধীনতার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারায় ব্যর্থতার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
মুসলমান সমাজ আজ হতলাঞ্ছিত, হতাশার গ্লানি ও পরাধীনতার দুঃসহ পীড়নে নিপতিত। জাতীয় জীবনে মুক্তি পাগল মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে প্রত্যাশিত লক্ষ্যের আশা সুদূর পরাহত। দুঃখ, কষ্ট এবং অত্যাচারের পীড়নে জাতি হতাশাগ্রস্থ। পরাধীনতার দিন-যাপনের গ্লানি নিয়ে মুসলমানরা কোন মতে টিকে আছে। নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য এ সীমাহীন দুর্ভোগ আজ জাতির জীবনে নেমে এসেছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'পাঞ্জেরী' কবিতা অবলম্বনে মুসলিম পুনর্জাগরণের একটি চিত্র অঙ্কন করুন।

সৃজনশীল কাজ

১. এ কবিতাটিতে বহু আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দ আছে। সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিজে নিজে বাক্যে প্রয়োগ করুন।

২. পরাধীনতার মর্মজ্বালা যে কোন জাতিকে পীড়িত করে। ১৯৭১ পূর্ববর্তী কালের বাংলাদেশের জন সমাজের মর্মজ্বালার কারণগুলি অনুসন্ধান করে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৩. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অনেক কবিতায় আরবি, ফার্সী শব্দের ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ কবিতাগুলি সংগ্রহ করে তুলনামূলক ভাবে পাঠ করুন।

৪. তুফান, শ্রান্ত খা'ব, দরিয়া, অথই ভ্রান্তি, বিস্বাদ শর্বরী ইত্যাদি শব্দ সমন্বিত বিশিষ্ট প্রয়োগের তাৎপর্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ৩১ শ্রাবণ ১৩৩৩ সালে। কিশোর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। স্বল্প আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন সুকান্ত। তাঁর কাব্যচর্চার সময় মাত্র ৬/৭ বছর। ১৯৪০ সালে ১৪ বছরের কিশোর কবি কবিতা লিখে চমকে দেন সবাইকে। যে যুগে সুকান্তের আবির্ভাব, সে যুগে ব্রিটিশ ভারতের অবস্থা ছিলো বড়োই বেসামাল। স্বদেশী আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং শ্রেণী সংগ্রামের জোয়ার এসেছিলো দেশে। সুকান্ত ছিলেন খুব স্পর্শকাতর এবং সচেতন। দরিদ্র এবং বঞ্চিত জনতার সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেছেন। মনে মনে কৃষক-শ্রমিককে কাতারে দাঁড়িয়ে তাদেরই একজন হয়ে প্রতিবাদের ভাষায় কথা বলেছেন কবিতায়। তাঁর ভাষায় ছিলো আশ্চর্য শক্তি। বক্তব্য ছিলো স্পষ্ট এবং শানিত। এ ব্যাপারে কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল ছিলো। শোষিত মানুষের জন্য তিনি কিছু গানও লিখেছেন। বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুকান্তের স্থান শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সার্থক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। 'ছাড়পত্র' তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অকাল মৃত্যু এক শোকের ঘটনা হয়ে আছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৩৫৪ সালের ২৯ বৈশাখ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুকান্তের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, হরতাল ইত্যাদি।

ভূমিকা

সুকান্ত ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর মধ্যে 'রানার' অন্যতম একটি কবিতা। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' থেকে কবিতাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। 'রানার' কাহিনীধর্মী কবিতা। রানার শব্দের আক্ষরিক অর্থ দ্রুতগামী ডাক বহনকারী বা ডাক-পিওন। খবরের বোঝা হাতে নিয়ে গ্রাম থেকে রাতের অন্ধকারে তাদের ছুটতে হয় শহরে। ভোর হওয়ার আগেই খবরের বোঝা 'মেল' গাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। মিটমিটে আলো এবং ঘণ্টার শব্দ শুনলেই লোকে বুঝতো রানার ছুটছে। দায়িত্ব পালনে তারা এতোই একনিষ্ঠ যে ঘরের অভাব, ঘরের প্রিয়জনের কথা, এমন কি নিজের ঘুম বা ক্ষুধার কথাও মনে থাকতো না কাজের সময়। কবির প্রশ্ন, নিজের সুখ দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য ভুলে এ যে নিরন্তর শ্রম দান করছে রানার, বিনিময়ে সে কী পাচ্ছে? তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করে শুধু অন্যের সেবায় তার কী লাভ? কবি আহ্বান জানাচ্ছেন রানারকে, এবার নতুন খবর আনতে হবে। যে খবরের বোঝায় থাকবে সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি। আর সেই খবর আরো দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে শোষিত বঞ্চিত জনসাধারণের কাছে। সমস্ত ভীরুতা ফেলে জেগে উঠতেই হবে সর্বহারাদের জীবনের দাবি নিয়ে। কবি মনে প্রাণে তা চাইতেন এবং সে জন্যই তাদের উদ্দেশ্যে জাগার গান শুনিয়েছেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

২. কবির রাজনীতি ও গণসচেতনা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- রানারের দায়িত্ব সম্বন্ধে জানতে এবং সংক্ষেপে তা লিখতে পারবেন।
- রানারের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনের কথা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
রানার – ডাক পিওন। **দিগন্ত** – দিকের সীমা, দূর থেকে দেখলে যেখানে আকাশ মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে মনে হয়। **দুর্বার** – বাধা দেয়া কঠিন এমন। **দুর্জয়** – জয় করা শক্ত এমন। **সবেগে** – বেগের সঙ্গে। **মাভৈঃ** – ভয় নেই (সাহস দেয়ার শব্দ)। **ক্ষুধিত** – পেটে খিদে থাকা। **'মেলে'** – ডাকের গাড়িতে। **অনুরাগে** – প্রেমের অনুভব। **বিনিদ্র** – ঘুমহীন।	রানার ছুটেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে, রানার! রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার– কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার। রানার! রানার! জানা-অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে, বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে; রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়, আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার-দুর্জয়। তার জীবনের স্বপ্নের মত পিছে সরে যায় বন, আরো পথ, আরো পথ–বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ। অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্ করে চায় : কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মত ধায়! কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে; হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্, জোনাকিরা দেয় আলো মাভৈঃ, রানার! এখনো রাতের কালো। এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে, পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'। ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে। অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে, ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

ভাবসংক্ষেপ

খবরের বোঝা নিয়ে রানার ছুটে চলে 'মেল' অর্থাৎ ডাকের গাড়ি ধরার জন্য। প্রাচীন ডাক ব্যবস্থায় রানারদের দায়িত্ব ছিলো স্থানীয় চিঠি পত্র নিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে শহরের 'মেলে' তা তুলে দেয়া। ঝড় ঝঞ্ঝা অন্ধকার সব কিছুকে তুচ্ছ করে রানার অতি দ্রুত বেগে দৌড়ুতে থাকে তার গন্তব্যে পৌঁছুনোর লক্ষ্যে। তার পথ চলার সঙ্গী হলো লণ্ঠন আর ডাকের লাঠিতে বাঁধা ঘণ্টা। ঐ ঝুম ঝুম ঘণ্টা শুনলেই গ্রামের লোকে বুঝতো যে রানার ছুটছে। তার সবচেয়ে ভয়, কখন বুঝি সূর্য উঠে যায়। কবির দরদী মন ভাবে, রানারের এই কঠিন শ্রম যাদের জন্য, তারা তো এর মূল্য দেয় না। রাতের পর রাত বছরের পর বছর কতো গ্রাম মাঠ ঘাট পার হয়ে পেশাগত দায়িত্বের জন্য পরের বোঝা বইতে গিয়ে নিজের ঘরের দায়িত্বটুকুও পালন করা হয় না। হয়তো ঘরে প্রিয়জনেরা বহু বিনিদ্র রাত কাটায় রানারেরই চিন্তায়। ক্ষুধায় শ্রমে ঘামে ক্লান্ত রানার তবু ছোটে সামান্য অর্থের জন্য। এ অর্থই ওদের জীবনের সম্বল। স্নেহ মমতা ভালোবাসা প্রকাশের সময় নেই তাদের। এতোই হতভাগ্য ওরা!

পরের চিঠি-পত্রে বোঝা টানাই রানারের কাজ। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তারা যে অর্থ পায় সেটাই তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। সুতরাং আঁধার বিপদ সব কিছুকে তুচ্ছ করে রাতের পর রাত রানার বহু পথ অতিক্রম করে। গ্রাম থেকে খবরের বোঝা এনে পৌঁছে দেয় শহরের ডাকের গাড়িতে। ঘরের প্রিয়জনদের কথা ভাবারও সময় নেই তার। তাদের শ্রমেই সচল থাকে ডাক ব্যবস্থা। উপকার হয় বহু লোকের। কিন্তু রানারের কষ্টের কথা কেউ ভাবে না। তার শ্রম ও ঘামের উপযুক্ত মূল্যও দেয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. রানার কেমন করে ছোটে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

২. 'জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে' কার উদ্দেশ্যে কবি এ কথাগুলো বলেছেন, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. 'দিগন্ত থেকে দিগন্তে' কে ছোটে, কেনো ছোটে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. রানার কবিতার প্রথম স্তবক মুখস্ত লিখুন এবং প্রত্যেক চরনের শেষের শব্দের নিচে দাগ দিয়ে অন্ত্যমিল দেখুন।

১. রানার কেমন করে ..... লিখুন।

উত্তর : 'রানার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ডাক বহনকারী বা ডাক পিওন। তার কাজ হলো স্থানীয় চিঠিপত্র রাতারাতি বহন করে শহরে সকালের 'মেল' গাড়িতে পৌঁছে দেয়া।

যে যুগে রানার চিঠির বোঝা বহন করে নিয়ে যেতো তখন বৈদ্যুতিক আলো ছিলো না গ্রাম গঞ্জে এবং রাস্তায়। তাই অন্ধকারেই তাকে পথ চলতে হতো। সেজন্য তার হাতে থাকতো টিম টিমে আলোর লণ্ঠন। পিঠে চিঠির বোঝা। ডাক বহনের লাঠিতে ঘণ্টা। কখন সূর্য উঠে যায়, এ ভয়ে সে দ্রুত বেগে গ্রাম মাঠ ঘাট বন পথ পার হতো। আকাশে তারা জ্বলতো মিটমিট করে। জ্বলতো সহস্র জোনাকীর আলো। কোনোদিকে ফিরে তাকাবার সময় থাকেনা তার। শুধু ছোটা আর ছোটা। ঝুমঝুম শব্দ তুলে যতো জোরে সম্ভব গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ছোটাই তার একমাত্র কাজ।

২. 'জীবনের সব রাত্রিকে ..... লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতা থেকে এ লাইনটি গ্রহণ করা হয়েছে। দরিদ্র রানারের উদ্দেশ্যে কথাগুলো কবি বলেছেন। কথাগুলোর মধ্যে করুণ বেদনার সুর শোনা যায়। মনে হয় শ্রান্ত-ক্লান্ত রানারের জন্য কবি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন।

রাত্রি হলো মানুষের জীবনে বিশ্রামের সময়। প্রিয়জনকে সঙ্গ দেয়ার সময়। কিন্তু রানারের কাজটাই এমন যে সারারাত পিঠে বোঝা আর হাতে লণ্ঠন নিয়ে তাকে ছুটতে হয়। তাছাড়া আঁধার রাতে পথ চলতে কতো বিপদ আপদের ভয় থাকে। সে কথা ভাবারও সময় নেই রানারের। সামান্য অর্থের বিনিময়ে শ্রমে ঘামে ভিজে রানার অবিরাম ছোটে শহরে ডাক পৌঁছে দেয়ার জন্য। দরিদ্র শ্রমিকের এ কষ্টের জীবন কবিকে ব্যথিত করে। তিনি ভাবেন, কতো অল্পদামে ওরা রাতের আরাম বিশ্রাম এবং নিদ্রাকে বিকিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে কিনেছে প্রিয়জনের অভিমান বেদনা আর রাত্রি জাগার দীর্ঘশ্বাস। কবির অনুভব পাঠকের মনকেও ছুঁয়ে যায় খুব সহজে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- রানারের দুঃখের জীবন সম্বন্ধে জানতে ও লিখতে পারবেন।
- রানারের উদ্দেশ্যে কবির বক্তব্য কি তা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
নির্জন – জন মানব শূন্য। **দস্যু** – ডাকাত। **তৃণ** – ঘাস। **সহানুভূতি** – দরদ। **স্পর্শ** – ছোঁয়া। **কালো রাত্রির ঘাম** – খামের মধ্যে চিঠি বন্ধ থাকে। কেউ তা দেখতে পায় না। কবি রাত্রিকে এখানে বন্ধ খামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাতের অন্ধকারে অনেক কিছুই ঢেকে যায়। চিঠির কথা মেযন বন্ধ খামে ঢাকা থাকে, মানুষের দুঃখ বেদনার অনেক ঘটনাই তেমনি রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। এমন শব্দ প্রয়োগে কবিতার ভাব গাঢ় হয়।	রানার! রানার! এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?: রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে? ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া, পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া, রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে, দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে কত চিঠি লেখে লোকে– কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও, এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ, এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে, এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে। দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি, – রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে? কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে? রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে– আকাশ হয়েছে লাল, আলো স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?

ভাবসংক্ষেপ

কবির দৃষ্টিতে রানার সর্বহারাদের প্রতিনিধি। বোঝা টেনেই ওদের জীবন একদিন শেষ হয়। সামান্য অর্থের জন্য ওরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। ক্ষয় করে জীবনী শক্তি। ওদের পিঠেই থাকে টাকার বোঝা। কিন্তু সেই টাকা তার নয়। সে শুধু বাহক মাত্র। তার পিঠের বোঝায় থাকে কতো মানুষের সুখ দুঃখের কথা লেখা চিঠি। কিন্তু তার মনে যে কতো দুঃখ,

তার যে কতো অভাব, সে কথা কেউ লেখে না। তাই কেউ জানতেও পারেনা। কবি কল্পনা করছেন, হয়তো যে ঘাসের উপর দিয়ে রানার দৌড়ায়, সেই ঘাসই তার মনের ব্যথা টের পায়। আকাশ যে এতো উদার, তারও যেনো রানারের জন্য কোনো দরদ নেই। তাই কবি রানারকে বলেন যে এ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বোঝা বয়ে জীবন ক্ষয় করে কি লাভ? ভোর হয়ে এলে রাতের আঁধার যেমন কেটে যায়, তেমনি করে রানারের দুঃখও যদি কেটে যেতো। কিন্তু কবে আসবে সেই সুদিন? কবির এ প্রশ্নে আছে অধিকার আদায়ের কথা। আছে প্রতীক্ষার বেদনার কথা।

শত সহস্র চিঠি, সংবাদ আর টাকার বোঝা বয়ে বয়ে রানারের জীবনী শক্তি শেষ হয় অকালেই। সে পেশায় ডাক বাহক, তাই তাকে বোঝা বইতেই হয়। কিন্তু তারও আছে অভাব, দুঃখ, বেদনা এবং কষ্ট। সে কথা কেউ কোনোদিন লেখে না। তাই সর্বহারার কবি রানারকে বলছেন- কেনো পরের জন্য জীবন ক্ষয় করছে সে? ভোর হলে রাতের আঁধার যেমন কেটে যায়, তেমনি তারও দুঃখের শেষ যদি হতো? কিন্তু কবে আসবে সেই সুদিন? কবে শ্রমিক মজুর সর্বহারা শ্রেণী শেষকের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে? সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকবেন কবি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. রানারের সবচেয়ে বেশি ভয় কাকে, দস্যুকে না সূর্যকে, সংক্ষেপে লিখুন।

২. কেনো শহর কিংবা গ্রামের কেউ রানারের দুঃখের কথা জানবে না, সংক্ষেপে লিখুন।

৩. কবি রানারের উদ্দেশ্যে কী বলেছেন, নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. 'আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল' – কাকে উদ্দেশ্য করে কে এ প্রশ্ন করেছেন, সংক্ষেপে লিখুন।

১. রানারের সবচেয়ে ভয় ..... লিখুন।

উত্তর : রানারের কাজ হলো স্থানীয় চিঠিপত্র সংবাদ ইত্যাদির বোঝা বয়ে শহরে নিয়ে যাওয়া এবং সকালের আগেই 'মেল' গাড়িতে সেগুলো পৌঁছে দেয়া। সেজন্য রানারকে রাতের অন্ধকারেই পথ চলতে হয়। সে যুগে গ্রাম-গঞ্জের পথে ঘাটে বনের রাস্তায় আলো থাকতো না। অন্ধকারে সুযোগ বুঝে দস্যুও কখনো কখনো আক্রমণ করতো রানারকে। টাকাগুলো লুট করে নিয়ে যেতো দস্যু। চিঠি এবং টাকা পরের ধন, রানার বাহক মাত্র। তার কাজ নিরাপদে সেগুলো জায়গামতো পৌঁছে দেয়া। রানার তার পেশার কারণেই সাহসী। রাতের নির্জনতা, রাতের আঁধার কিংবা দস্যুকে সে ভয় করে না। সবচেয়ে বেশি ভয় তার সূর্যকে। সূর্য ওঠার অর্থ হলো, সময়মতো কাজটা হলো না। এ ব্যর্থতা সে কিছুতেই চায় না। চমৎকার কাব্যিক ভাষায় কবি কথাগুলো বলেছেন। রানারের সৎ চরিত্রও প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

৩. কবি রানারের উদ্দেশ্যে ..... নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত ছিলেন সর্বহারা শ্রেণীর দরদী কবি। শোষিত ও বঞ্চিত শ্রমিক কৃষকদের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি কাতর হতেন। ধনী শোষকদের প্রতি ক্ষোভ জাগতো মনে। পরিশ্রমের উচিত মূল্য না পেয়ে গরিবরা কেনো ধুঁকে ধুঁকে মরবে– এ ছিলো তাঁর প্রশ্ন সচেতন কবি কবিতার ভাষায় তাঁর প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। 'রানার' কবিতায় তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে রানারকে বলছেন যে কেনো তারা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে? সামান্য অর্থের জন্য কেনো নিজেকে ক্ষয় করে? ক্ষুধার ক্লান্তিতে বিশ্রাম এবং খাবার না পেয়েও কেনো তারা বোবা পশুর মতো কাজ করে যায়? তাদের এখন প্রতিবাদ করার সময়। সর্বহারাদের দুঃখের শেষ হওয়া প্রয়োজন। ভোর হলে শ্রমের কালো রাত কেটে যায় যেমন করে, তেমিন করে আলোর স্পর্শে তাদের জীবনের দুঃসময়ও যেনো কাটে। কবির এ চাওয়া সর্বকালের সর্বকালের সমস্ত সর্বহারাদের জন্য প্রেরণা হয়ে আছে আজও।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষার জন্য রানারকে কবি কি কি বলেছেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
শপথ – প্রতিজ্ঞা। **ভীরুতা** – ভয়। **অগ্রগতির মেল** – দ্রুতগামী গাড়ি। অন্য যে কোন যানের চেয়ে মেলগাড়ি দ্রুত চলে। এখানে শোষণ মুক্তির যে খবর ঘরে ঘরে কবি পৌঁছাতে বলেছেন, তা যেনো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন 'অগ্রগতির মেল' শব্দ ব্যবহার করে। **দুর্দম** – যা দমন করা কঠিন এমন	রানার! গ্রামের রানার! সময় হয়েছে নতুন খবর আনার; শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে– পৌঁছে দাও এ নতুন খবর অগ্রগতির 'মেলে', দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি– নেই, দেরী নেই আর, ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে দুর্দম, হে রানার :

ভাবসংক্ষেপ

রানারকে কবি প্রতিবাদের সাহস দিয়েছেন। সমস্ত ভীরুতা ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়ে বলেছেন যে এখন নতুন শপথের খবর আনার সময় হয়েছে। এ নতুন খবর হবে মুক্তির খবর। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার খবর। মেল গাড়িতে যেমন দ্রুত খবর পৌঁছে যায়, শোষণের হাত থেকে মুক্তির খবরও তেমনি দ্রুত এবং দুর্বার গতিতে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে অগ্রগতির 'মেলে'। কবি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, প্রভাতের আর দেরি নেই। সূর্য উঠলেই যেমন সব আলোয় ঝলমল করে ওঠে, তেমনি ভাবে সর্বহারাদের জীবনও হয়ে উঠবে আনন্দে ভরপুর যখন মুক্তি আসবে। সূর্য বা প্রভাতকে কবি এখানে মুক্তির দূত বলতে চেয়েছেন। যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকরা প্রভাতকে স্বাগত জানিয়েছেন শুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে।

রানারকে সমস্ত ভীরুতা ফেলে জীবনের ন্যায্য দাবি উচ্চারণের সাহস দিয়েছেন কবি। নতুন শপথের খবর এনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। যে খবরে থাকবে মুক্তির কথা। খুব দ্রুত সে খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তখন রানারের গতি যেনো হয় আরও দুর্দম, আরো দুর্বার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'সময় হয়েছে নতুন খবর আনার' –এ কথা রানারকে কেনো বলা হয়েছে তা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন।

২. বিরাম চিহ্ন দেখে জোরে জোরে কবিতার এ অংশটুকু পড়ুন। তারপর খাতায় লিখুন।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

১. 'সময় হয়েছে ..... লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত রানার কবিতায় সর্বহারাদের পক্ষ হয়ে শোষণের বিপক্ষে কথা বলেছেন। রানার চিঠি পত্রের বোঝা নিয়ে শহরের দিকে ছোটে 'মেলে' তা পৌঁছে দেয়ার জন্য। সারারাত তাকে পথ চলতে হয়। রাতের নির্জনতা, আঁধার, দস্যুর ভয়– সব কিছুকে তুচ্ছ করে ভোরের আগেই তাকে পৌঁছুতে হয় শহরে। ঘামে-শ্রমে তার প্রচণ্ড কষ্ট হয়। ঘরে অভাব অথচ তা দূর করার মতো অর্থ সে পায় না। ঘরের প্রিয়জনদের জন্য সময় দিতে পারে না সে। প্রতি রাতেই তার কাজ। পরের জন্য কাজ করতে করতে জীবনের সাধ আহলাদ ত্যাগ করতে হয়। ক্ষয় হয় জীবনীশক্তি। এ তো শোষিত কৃষক মজুরদের জীবনের চিত্র। তাই কবি রানারকে সাহস দিয়ে বলেছেন, এখন সময় হয়েছে নতুন খবর আনার। এ খবর মুক্তির খবর। সমস্ত ভয় ভীতি ফেলে দিয়ে নতুন শপথের সংবাদ আনতে হবে তাকে। আর সেই মুক্তির খবর পৌঁছে দিতে হবে দ্রুত গতিতে – প্রতি ঘরে ঘরে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. কাদের প্রতিনিধি হিসেবে কবি রানারের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, বিশদভাবে এর মূল ভাব বুঝিয়ে লিখুন।

২. 'রানার' কবিতার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায়

৩. প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন :

ক. 'ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া, পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোয়া,

খ. 'জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে'

৪. টীকা : কালো রাত্রির খামে, অগ্রগতির মেলে, শপথের চিঠি।

নমুনা প্রশ্নোত্তর

১. কাদের প্রতিনিধি হিসেবে ---------- বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে রানারের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যে শ্রেণী বোবা পশুর মতো কাজ করে কিন্তু উপযুক্ত মজুরী পায় না, যে শ্রেণী সমাজের ধনী শ্রেণীর চাকা সচল রাখে প্রচণ্ড শ্রম দিয়ে কিন্তু নিজেরা রাতে ঘুমানোর সময় পায় না- রানার তাদের একজন।

যে সময় সুকান্ত কাব্যচর্চা শুরু করেন তখন ব্রিটিশ ভারতের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। একদিকে স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, অন্যদিকে কৃষক মজুরদের আন্দোলনে দেশের অবস্থা ছিলো করুণ। কবি ছিলেন দরিদ্র শোষিত এবং বঞ্চিত জনতার পক্ষে। শ্রমিকের ঘাম, দরিদ্রের অভাব, বঞ্চিতদের বেদনা কবিকে ব্যথিত করে তুলতো। একদিকে প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে অনাহার অর্ধাহারের চিত্র দেখে তিনি প্রতিবাদীর ভূমিকায় নামেন। তাঁর হাতিয়ার ছিলো লেখনী। ভাষায় ছিলো শক্তি। শোষকের বিরুদ্ধে কঠিন শব্দ উচ্চারণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। সমাজ সচেতন কবির কাব্য চর্চার বিষয়বস্তু ছিলো অসহায় জনতা এবং তাদের নিদারুণ দুঃখ কষ্টের জীবন। রানার তাদেরই একজন হয়ে 'ছাড়পত্র' কাব্যে স্থান পেয়েছে।

রানার শব্দের আক্ষরিক অর্থ দ্রুতগামী ডাক বাহক। সোজা কথায় ডাক পিওন। স্থানীয় চিঠিপত্র সংবাদ টাকা ইত্যাদির বোঝা কাঁধে নিয়ে সে ছুটে চলে শহরের দিকে। গ্রামের সংবাদ বয়ে এনে শহরের 'মেলে' পৌঁছে দেয়াই তার কাজ। পথঘাটে কোনো আলো নেই। তাই রানারের হাতে থাকতে মিটমিটে একটা লণ্ঠন, পায়ে ঝুমঝুমি আর পিঠে খবরের বোঝা। তার যাত্রার সময় হলো রাত। সারারাত তাকে ছুটে চলতে হতো। ঝড় ঝঞ্ঝা, আঁধার, দস্যুর ভয় কোনো

কিছুই তার যাত্রা বন্ধ করতে পারতো না। কারণ সূর্য ওঠার আগেই রানারকে পথ মাঠ ঘাট বন পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে। এটাই তার দায়িত্ব। তার চাকরি। অতি সামান্য টাকার চাকরি। কিন্তু দায়িত্বের ভার অনেক বড়ো। তবুও সে কর্তব্যে অটল।

স্বাভাবিক কারণেই রানারের ঘরে অভাব। পৃথিবীর রূপ রঙ তার কাছে কালো ধোঁয়ার মতো ধূসর। প্রতি রাতে অবিরাম ছোটার শ্রমে ক্লান্ত শরীরে ক্ষুধার কষ্ট আরও বেশি মনে হয়। ঘরে প্রিয়জনেরা তার সঙ্গ পায় না। তারা কতো রাত না ঘুমিয়ে কাটায়। রানারের বিপদ আপদের কথা ভেবে উৎকণ্ঠায় ভোগে। কিন্তু গরিবের সংস্কারে আবেগের কোনো দাম নেই। দাম নেই স্নেহ মমতা মায়া ভালোবাসার। সেখানে সবচেয়ে বড়ো ক্ষুধা। আর ক্ষুধা মেটানোর জন্য কাজ করা। তা সে যতোই কষ্টের কাজ হোক।

কতো শত লোকের চিঠির বোঝায় সহস্র সুখ দুঃখের কথা বয়ে নিয়ে যায় রানার। কিন্তু তার সুখ দুঃখের কথা কেউ জানে না। জানতে চায়ও না। রাতের কালো আঁধারে সেগুলো চাপা পড়ে থাকে। এমনি ভাবেই বঞ্চিত মানুষের জীবন ক্ষয়ে যায় ধীরে ধীরে।

কবি সুকান্ত এ বোবা সহনশীলতার প্রতিবাদ জানিয়েছেন রানার কবিতার। স্পষ্ট বলেছেন, কেনো এতো কষ্ট করবে রানার? কেনো তাদের জন্য এতো অন্যায় বঞ্চনা? সব আঁধারই তো একদিন কেটে যায়! সূর্য উঠলে কাটে রাতের অন্ধকার। তাহলে রানারদের জীবনের আঁধার কাটবে না কেনো? কেনো তাদের জীবনে আশার সূর্য উঠবে না? রানারকে কবি জীবনের দাবির কথা বলতে শিখিয়েছেন। বলেছেন –সব ভয় ফেলে দিয়ে নতুন খবর আনতে হবে। সে খবর হবে মুক্তির খবর। শোষণের কষ্ট থেকে বেরিয়ে আপনার জন্য শপথ নিতে হবে। আর এ খবর অতি দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে ঘরে ঘরে। জাগাতে হবে সবাইকে।

শোষিত শ্রেণীর কবি হিসেবে তাই সুকান্ত আজও দুঃখী জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র।

৩. ব্যাখ্যা করুন :

উত্তর : ৩. খ ব্যাখার জন্য পাঠ ১-এর ২নং নমুনা উত্তর দেখুন। বাকিটা নিজে লিখুন।

৪. টীকা লিখুন :

উত্তর : পাঠ ২ এবং পাঠ ৩ -এ দেখুন। বাকিটা নিজে লিখুন।

ভাষার বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

১. রানার কবিতার প্রতি চরণের শেষ শব্দটি খাতায় লিখুন এবং মিলগুলো লক্ষ্য করুন। যেমন :

..... রাতে	..... রানার	..... আলো
..... হাতে	..... মানায়	..... কালো
..... কাঁধে	..... ধোঁয়া	..... হবে
..... সংবাদে	..... ছোঁয়া	..... কবে

[কবিতার প্রতি চরণে সমান মাত্রা না থাকলেও প্রতি দুই লাইনের শেষ শব্দে মিল আছে। একে অন্তমিল বলে।]

২. কবিতার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করা হয়। তারই কয়েকটি :
অবাক রাতের তারা, কালো রাত্রির খাম
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, অগ্রগতির 'মেলে'

[ভালো করে বুঝে ব্যবহার করতে শিখুন।]

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

১. কবিতাটি গান হয়েছে। সলিল চৌধুরীর দেয়া সুরে গানটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সম্ভব হলে শুনুন।

আরও যা পড়তে পারেন

১. 'রানার' কবিতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ডাক হরকরা, কবিতা ও তারাশঙ্করের 'ডাক হরকরা' গল্পের বেশ মিল আছে। পড়ে দেখতে পারেন।
২. সম্ভব হলে সুকান্তের কাব্যগ্রন্থগুলো পড়ুন।

তোমাতে অমর আমি

আহসান হাবীব

কবি পরিচিতি

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি বর্তমান পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে কবি আহসান হাবীব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিজুদ্দীন হাওলাদার, মাতা জমিলা খাতুন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও ভাবুক প্রকৃতির। নদী বিধৌত বৃহত্তর বরিশালের পল্লিপ্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো শৈশবেই। ছাত্রজীবনেই তাঁর কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয়।

পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আহসান হাবীব-এর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৯৩৪ সনে ঐ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থাভাবের কারণে ১৯৩৬ সনে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে আহসান হাবীব কলকাতা চলে যান জীবিকার সন্ধানে। এ- সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার সূচনা।

কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি। ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পদিত 'তকবীর' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে পেশা-জীবন শুরু হয়েছিলো তাঁর। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কমরেড পাবলিশার্স থেকে আহসান হাবীব-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষ' প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই আহসান হাবীব কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। সাম্প্রতিক কবিতার উত্তরাধিকার বহন করেই স্বতন্ত্র কবিকণ্ঠ হিসেবে আহসান হাবীব তাঁর আত্মপরিচয় ঘোষণা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আহসান হাবীব ঢাকা চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এ-সময় থেকেই তাঁর কাব্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। বাংলাদেশের কবিতায় আহসান হাবীব এক বিশিষ্ট নাম। মেধার মনন ও আবেগকে শিল্পে রূপ দেয়ার অসাধারণ দক্ষতা ছিলো তাঁর। একদিকে গ্রামীণ নিসর্গ অন্যদিকে নাগরিক চেতনা, একদিকে আত্মঅন্বেষণ অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ অন্বেষণ আহসান হাবীব-এর কাব্যসাধানার প্রেরণা।

আহসান হাবীব-এর উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়া হরিণ (১৯৬২), আশায় বসতি (১৩৮১), দু'হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০)।
উপন্যাস : আরণ্য নীলিমা (১৯৬২)
শিশু-সাহিত্য : উপন্যাস : রাণীখালের সাঁকো (১৯৫৫)
ছড়া : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (১৩৮৪)
কবিতা : রেলগাড়ি ঝমাঝম (১)

পুরস্কার

অনুবাদের জন্য ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০-৬১) বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৭৮), কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক (১৯৯১), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), পদাবলী পুরস্কার (১৯৮২), আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪)।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. আহসান হাবীব-এর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. কবির গভীর স্বদেশ ও মাতৃভাষা প্রীতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

ভূমিকা

"তোমাতে অমর আমি" আহসান হাবীব-এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়া হরিণ' থেকে সংগৃহীত। 'ছায়া হরিণ' ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এর অধিকাংশ কবিতা পঞ্চাশের দশকে রচিত। এ পর্যায়ের কবিতায় আহসান হাবীব-এর ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সহজেই লক্ষযোগ্য। তাঁর কবিতায় পর্বান্তরের লক্ষণও এ-সময় থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্যসাধনার এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে স্থানান্তরের অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা 'ছায়া হরিণ-এর কবিতায় প্রচ্ছন্ন। তবে 'তোমাতে অমর আমি' কবিতাখানি ঐ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব থেকে সম্পর্ণভাবে মুক্ত। বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির মধ্যে আহসান হাবীব-এর "তোমাতে অমর আমি" কবিতাখানি বিশিষ্ট।

কবি আহসান হাবীব নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন যে, মাতৃভাষা তাঁর সমগ্র সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ভাষাচর্চার মধ্য দিয়েই তিনি অর্জন করেছেন মহত্তম শিল্পীর মহিমা- যা অকৃপণ বাংলা ভাষারই অবদান। কবির চেতনায় বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিবিড়ভাবে সংলগ্ন, তাঁর সত্তারই অন্য নাম মাতৃভাষা। কবির ভাষায় বাংলা ভাষা "আশার আলার এক অনবদ্য প্রতিমার মত।"

"তোমাতে অমর আমি" অসমপার্বিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত গদ্য কবিতা। প্রবহমানতা, অন্তঃছন্দ সাবলীল উপমা এবং সহজ শব্দের বুনন কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভাষা বিষয়ে কবির বাস্তবিক আবেগের শুদ্ধ উচ্চারণ শোনা যায় 'তোমাতে অমর আমি' কবিতায়। বিষয়গৌরবে এবং শিল্পমূল্যে কবিতাটি অসামান্য। ভাষার আশ্রয়ে কবি অমরতা প্রত্যাশা করেন বলেই কবিতাটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- ভাষার রহস্য প্রসঙ্গে কবির শৈশবের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভাষার মহিমা আবিস্কারে কবির অনুভূতির বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- ভাষাকে অর্জন করার সূত্রে কবি আর কী কী পেয়েছেন তার পরিচয় পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মুলপাঠ
তৃষ্ণা – প্রবল ইচ্ছা, এখানে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা অর্থে। **ব্যাকুলতা** – উৎকণ্ঠা। **নিষ্পাপ মূঢ়তা**–শিশুর পাপশূন্য নির্বুদ্ধিতা বা সহজতা। **অনন্যমনে** – একাগ্রচিত্তে, একমনে। **স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার** – নীরবতার মধ্যে ভাবনার সমুদ্রে খেলা। **মাধুরী** – মধুরতা, মাধুর্য।	মায়ের দু'চোখে শুধু তৃষ্ণা আর সারা মুখে তার কি গভীর ব্যাকুলতা বুঝিনি! আমার শিশু চোখে নিষ্পাপ মূঢ়তা; কেবল অনন্যমনে স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার। মাকে চিনি, খেলার পুতুল, লাল ফুল, সাদা দেয়ালের সব ছবি চিনি; তবু জানি না কোথায় নামের মাধুরী আছে লুকিয়ে; মাকেও মা বলে ডাকার সেই কথা আর সুরের সুন্দর মিশ্রিত মহিমা আছে কোথায় লুকিয়ে জানি না।

মহিমা – মাহাত্ম্য মর্যাদা। **আঁধার** – অন্ধকার। **তোমার বুকের হীরে** – মাতৃভাষার মণিমুক্তো অর্থে। **অনিন্দ্যপ্রাণের** – সুন্দর মনের।	একদা মায়ের মুখের সেই তৃষ্ণার আঁধার অতঃপর আলো হয়ে আমার অধরে রেখেছে চুম্বন; আমি মা বলে ডেকেছি মাকে। আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি। যৌবনের সব তৃষ্ণা একটি মুখে যখন খুঁজেছে পৃথিবীকে, ক্লান্ত দিনে আশ্রয় চেয়েছে; ফুল পাখি আকাশের চাঁদ দু'হাতে যখন তার তুলে দিতে চেয়েছি, তখন তুমি ছিলে সঙ্গী, তাই সহজেই তাকে পেয়েছি; কেননা তারো আগে তোমার বুকের হীরে নিয়ে তারই জন্যে মালা গেঁথে রেখেছি। তোমাকে পেয়েছি, পেয়েছি তাই সে অনিন্দ্যপ্রাণের সঙ্গীকে।

ভাবসংক্ষেপ

সন্তানের জন্য মায়ের দু'চোখ জুড়ে স্নেহের তৃষ্ণার আর নিবিড় উৎকণ্ঠতার অর্থ কবির শিশুমন অনুধাবন করতে পারেনি। কবির শিশুচোখ নিষ্পাপ সহজতায় একমনে ভাবনার সাগরে সাঁতার কেটেছে। মায়ের দৃষ্টির অর্থ তবু জানা হয় নি তাঁর। মা তাঁর অতি পরিচিত। খেলার সামগ্রী, লাল ফুল, দেয়ালে আঁকা ছবি সবই তাঁর চেনা। তবু জানা নেই তাঁর এ-সব শব্দের ভেতরকার মাধুর্য। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্যে শব্দ ও সুরের মিশ্রণে যে মাহাত্ম্যলুকানো আছে তাও জানা হয়নি তাঁর শিশু বয়সে।

একসময়ে মায়ের স্নেহের তৃষ্ণা আলো হয়ে শিশুর ঠোঁটে স্নেহচুম্বন রেখেছে; স্নেহসিক্ত কবি মা বলে ডেকেছেন তাঁকে। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্য দিয়ে কবি আবিস্কার করেছেন প্রিয় মাতৃভাষাকে। মা ও ভাষা একই সঙ্গে ধরা দিয়েছে কবির কাছে। এরপর কবি যখন যৌবনে উপনীত হয়েছেন, তখন সমগ্র পৃথিবীকে খুঁজেছেন একটি সুশ্রী মুখের মধ্যে, ক্লান্ত কবি আশ্রয় চেয়েছেন তার মধ্যে। কবিতার শব্দে উপমায় বাগানের ফুল, আকাশের পাখি ও চাঁদ যখন প্রিয়ার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন, তখনও মাতৃভাষাই তার সুপ্রিয় সঙ্গী। মাতৃভাষা সঙ্গী ও সহায় ছিলো বলেই কবি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর প্রিয়াকে। কেননা মাতৃভাষার মণিমুক্তো দিয়ে তৈরি করা কবিতার মালা প্রিয়ার জন্যই কবি গেঁথে রেখেছিলেন। কবি মাতৃভাষাকে নিজের করে পেয়েছিলেন বলেই, সুন্দর মনের প্রেয়সীকে পেয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. ভাষার রহস্য প্রসেঙ্গ শৈশবের অনুভূতি কী ছিলো?
২. মা ও মাতৃভাষাকে কবি কীভাবে আপন করে পেলেন?
৩. প্রিয়াকে পাওয়ার ক্ষেত্রে কবি জীবনে ভাষার ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৪. 'তোমার বুকের হীরে' চরণাংশের তাৎপর্য লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : মা ও মাতৃভাষাকে কবি কীভাবে আপন করে পেলেন?

উত্তর : মায়ের দু'চোখ জুড়ে স্নেহের তৃষ্ণা ও উৎকণ্ঠার অর্থ শিশু বয়সের কবির কাছে ধরা দেয়নি। একমনে ভাবনার সাগরে সাঁতার কেটেছেন তিনি। মাকে তিনি চেনেন, আরও চেনেন পুতুল, ফুল, ছবি। কিন্তু এগুলির নামের মাহাত্ম্য এসব শব্দের মধ্যে কথা ও সুরের 'মিশ্রিত মহিমা' জানা হয়নি তাঁর। একসময় মায়ের স্নেহতৃষ্ণা যখন তাঁর ঠোঁটে আদরের চুম্বন এঁকে দিয়েছে, তখনই কবি মাকে 'মা' বলে ডেকেছেন। মাকে 'মা' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি যেমন মাকে নিবিড়ভাবে পেয়েছেন, তেমনি একই সঙ্গে লাভ করেছেন ভাষাকেও। মা ও মাতৃভাষা এভাবেই কবির চেতনায় একাকার হয়ে গেছে। মাকে পেয়েছেন বলেই কবি মাতৃভাষাকে আপন করে পেয়েছেন। কবির চেতনায় এভাবেই মাতৃভাষা মায়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন : 'তোমার বুকের হীরে' চরণাংশের তাৎপর্য লিখুন।

উত্তর : কবি যখন যৌবনে উপনীত হয়েছেন তখন সমগ্র পৃথিবীকে একটি সুন্দর মুখের মধ্যে সন্ধান করেছেন তিনি। পরিশ্রান্ত কবি ঐ মুখশ্রীর মধ্যে খুঁজেছেন আশ্রয়। ফুল পাখি চাঁদকে কবিতার শব্দে উপমায় সাজিয়ে ঐ সুশ্রীর হাতেই তুলে দিতে চেয়েছেন তিনি। কবির এ অন্বেষণ পর্বে, অন্বিষ্ট প্রিয়ার উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা রচনার স্তরে স্তরে মাতৃভাষা ছিলো তাঁর নিত্যসঙ্গী। কবির জীবনের সঙ্গে মাতৃভাষা নিবিড়ভাবে সংলগ্ন ছিলো বলেই কবি সহজেই প্রিয়াকে পেয়েছেন। মাতৃভাষার ভান্ডারে ছড়ানো রয়েছে যে শব্দ-হীরা বা মণিমুক্তো জহুরির দক্ষতা নিয়ে কবি সেগুলির মালা গেঁথেছেন প্রিয়ার জন্য। ভাষাকে আপন করে পেয়েছিলেন বলেই কবি সুন্দর মনের অধিকারিণী প্রিয়াকে লাভ করেছেন। ভাষার জন্যই কবির অভিজ্ঞতার জগৎ সম্প্রসারিত হয়েছে, সম্ভব হয়েছে কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি। প্রিয়াকে পাওয়ার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা তাই কবি জবিনের এক গুরুত্বপুর্ণ প্রসঙ্গ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। আমার
শিশুচোখে নিষ্পাপ মূঢ়তা;
কেবল অনন্যমনে স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার।

২। মাকেও
মা বলে ডাকার সেই কথা আর সুরের সুন্দর
মিশ্রিত মহিমা আছে কোথায় লুকিয়ে
জানিনা।

৩। আমি মা বলে ডেকেছি মাকে।
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।

৪। ফুল পাখি আকাশের চাঁদ
দু'হাতে যখন তার তুলে দিতে চেয়েছি, তখন
তুমি ছিলে সঙ্গী,

৫। তোমাকে
পেয়েছি, পেয়েছি তাই সে অনিন্দ্যপ্রাণের সঙ্গীকে।

উত্তর :

২। *মাকেও*

মা বলে ডাকার সেই কথা আর সুরের সুন্দর
মিশ্রিত মহিমা আছে কোথায় লুকিয়ে
জানিনা।

আলোচ্য কবিতাংশটুকু কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতার অন্তর্গত। উদ্ধৃত অংশে কবি 'মা' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কথা ও সুরের যে মিলিত মাধুর্য রয়েছে তার উৎস সম্পর্কে নিজের শৈশবের অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

কবি তাঁর শৈশবে মায়ের চোখে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা আর উৎকণ্ঠা লক্ষ করেছেন। কিন্তু মায়ের দৃষ্টির অর্থ তাঁর কাছে তখন স্পষ্ট ছিলোনা। একাগ্র মনে ভাবনার সাগরে তিনি সাঁতার কেটেছেন কিন্তু নিষ্পাপ-নির্বোধ শিশুর কাছে মায়ের দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য অর্থহীনই থেকে গেছে। মা তাঁর চেনা; যেমন চেনা খেলার পুতুল, রঙিন ফুল, নানান ছবি। কিন্তু মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্যে কথা আর সুরের সম্মিলিত যে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা জানা ছিলো না কবির শৈশবে। ভাষার তাৎপর্য, গৌরব ও মাহাত্ম্যতদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকেছে কবির কাছে, ততদিন পর্যন্ত মা ও মাতৃভাষা কবির অস্তিত্বের অংশ হয়ে ওঠেনি। যখন মাতৃভাষার ঐশ্বর্য অনুধাবন করেছেন তিনি, তখন মাকেও নতুন করে পাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়েছেন কবি।

৩। **আমি মা বলে ডেকেছি মাকে।**
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।

উদ্ধৃত চরণদুটি কবি আহসান হাবীব-এর 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্য দিয়ে কবি কীভাবে মাতৃভাষার মহিমা আবিষ্কার করলেন সে কথা বলা হয়েছে।

শৈশবে নিষ্পাপ মূঢ়তা নিয়ে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়েছেন কবি, মায়ের দৃষ্টির মধ্যে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা আর সন্তানের জন্য ব্যাকুলতার অর্থ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি তখন। ভাবনার সাগরেই কেবল সাঁতার কেটেছেন তিনি। খেলার পুতুল, রঙিন ফুল আর দেয়ালে আঁটা ছবির মতোই মা পরিচিত ছিলো তাঁর। মায়ের মূল্য ও মহিমা তখনও অনাবিষ্কৃত তাঁর কাছে। মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্যে যে মহিমা লুকানো রয়েছে ঐ শব্দটি উচ্চারণের মধ্যে কথা ও সুরের মিশ্রিত যে সৌন্দর্য সঞ্চিত আছে - তার মাধুর্য তখনও অজানা ছিলো কবির কাছে। এক সময় মায়ের স্নেহসিক্ত চুম্বন যখন তার ঠোঁটে আদরের প্রলেপ বুলিয়ে দিলো - শৈশবের কবি তখন মাকে 'মা' বলে ডাকলেন। ঐ সম্বোধনের মধ্য দিয়ে কবির ভাষাজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হলো - তিনি একই সঙ্গে মা ও মাতৃভাষাকে নিবিড় করে পেলেন। মাকে 'মা' বলে ডাকার মাধ্যমে মা ও মাতৃভাষা কবিসত্তায় নতুন মূল্যে অভিষিক্ত হলো।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- কবির কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাতৃভূমি, মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবেন।
- সত্তার প্রতিভূ হয়ে মাতৃভাষা কীভাবে কবিকে শিল্পীর মর্যাদায় মহামান্বিত করলো তার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এ দেশ – স্নেহময়ী জননীর মত যে দেশ-অর্থে প্রযুক্ত। **আমার দিনের সারা পথে** – কবির কাব্য সাধনার বিস্তৃত সময় পরিসরে। **বিচিত্র রঙের তুলি** – ভাষা সম্পদের নানা মণিমুক্তো। **ঐতিহ্য** – পরম্পরাগত কথা। **আজন্ম লালনে** – জন্ম থেকে সযত্ন পরিচর্যায়। **আজীবন** – বর্তমান অবধি অর্থে। **আত্মা থেকে অধরে** – প্রাণসত্তা থেকে মুখের ভাষায়। **মূর্ত** – প্রকাশিত। **অনবদ্য** – অনিন্দনীয়। **প্রতিমা** – প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি। **সভ্যতার অমর মিনার** – বাংলা ভাষা বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের স্মারক স্তম্ভ। এ-অর্থেই কবি চরণাংশটি ব্যবহার করেছেন। **জীবন মুকুর** – জীবনের দর্পণ, জীবনের আয়না। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে কবির মূল্যায়নের প্রকাশ ঘটেছে এ-দুটি শব্দে। **বাণীরূপ** – বাংলা ভাষা কবি আত্মা ভাষা প্রকাশ।	মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে। লিখেছি আপন মনে একা আমি আমার দিনের সারা পথে; মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে আমি আলোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ নানা রঙে এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে। ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে, আর আমাকে দিয়েছো এক মহত্তম শিল্পীর মহিমা আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো আলো তুমি সমগ্র সত্তায়; তুমি আছো আত্মাথেকে অধরে বিস্তৃত। এই দেশ দেশের মানুষ মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই আমার আত্মা এক অনবদ্য প্রতিমার মত। পাখিদের সব গান সব সুর তার পথিকের পদচিহ্ন তোমাতেই অমর, এবং তোমাতেই মূর্ত দেখি সভ্যতার অমর মিনার। জীবন মুকুর তুমি কেননা তুমিই এ আত্মা পিপাসার বাণীরূপ এবং তুমিই মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর মুখের কবিতা।

ভাবসংক্ষেপ

স্নেহময়ী জননীর মত সন্তানবৎসল্য স্বদেশের প্রতি কবির ভালোবাসার কথা লেখা আছে স্বদেশের প্রকৃতি জগতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে, আকাশে অরণ্যে। কবির কবিতায় স্বদেশের আকাশ, অরণ্য আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেশপ্রেমের বাণীরূপ হিসেবে বিধৃত হয়ে গেছে। সারা জীবনের কাব্য সাধনায় কবি একান্ত মনে তাঁর ভালোবাসার কথা – মা, প্রিয়া আর মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা লিখে রেখেছেন বরং এ ভালোবাসা মূর্ত হয়েছে মাতৃভাষার সম্পদ ঐশ্বর্য থেকে সংগৃহীত নানা মণিমুক্তোর সহায়তায়।

কবি কবিতা সৃজনের মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রদীপ ঘরে জ্বালিয়ে রেখেছেন, তার প্রতিটি শিখায় চিরায়ত মূল্য দান করেছে মাতৃভাষা। এভাবে কবিও লাভ করেছেন মহৎ শিল্পীর গৌরব। বাংলা ভাষা তার জন্ম লগ্ন থেকেই কবিদের চর্চার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালির সত্তার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। স্বদেশ, দেশের মানুষ এবং তাদের সুখ দুঃখময় জীবন ভাষার মধ্য দিয়ে হয়েছে মূর্ত। কবির কাছে প্রিয় মাতৃভাষা তাই তাঁর আত্মাই অনবদ্য প্রতিমূর্তি পাখির গান ও সুর, পথিকের পদচিহ্ন সবকিছুই ভাষার মধ্যে অমর হয়ে আছে, বাংলাভাষা আবহমান বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস ও ঐহিত্যের স্মারক স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। এ-ভাষা কবির জীবনেরই দর্পণ, তাঁর আকাঙ্ক্ষার বাণীমূর্তি। কবির কাছে প্রিয়ার মুখের কবিতা আর স্নেহময়ী জননীর মুখের কথারই অন্যনাম – মাতৃভাষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. 'আমার দিনের সারা পথে' চরণাংশটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২. কবির কাব্যচর্চায় মাতৃভাষা কী ভূমিকা পালন করেছে?

৩. কবির অনুসরণে মাতৃভূমি, মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্কের পরিচয় দিন।

৪. ভাষা কীভাবে কবিকে শিল্পীর মহিমা দান করলো?

৫. মাতৃভাষা কীভাবে কবি সত্তার অনিবার্য অংশে পরিণত হলো?

৬. 'আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো' – চরণটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : কবির অনুসরণে মাতৃভূমি, মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্কের পরিচয় দিন।

উত্তর : সমগ্র জীবনের কাব্য সাধনায় কবি তাঁর ভালোবাসার কথা, – মা, প্রিয়া আর মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা একান্ত মনে কবিতার শরীরে গ্রথিত করে রেখেছেন। মাকে 'মা' ডেকে তিনি যেমন ভাষাকে আপন করে পেয়েছেন, তেমনি দেশকে এবং প্রিয়াকেও ভাষাচর্চার মধ্য দিয়ে নিবিড়ভাবে অর্জন করেছেন। কবি তাঁর ভালোবাসার কথা ঐশ্বর্যময়ী ভাষার সম্পদ ভান্ডারের মণিমুক্তো দিয়ে নানা বর্ণে গন্ধে সুষমায় স্বরচিত কবিতায় এঁকে রেখেছেন। কবির অনুভবে মা, মাতৃভূমি ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে সংলগ্ন।

প্রশ্ন : মাতৃভাষা কীভাবে কবি সত্তার অনিবার্য অংশে পরিণত হলো?

উত্তর : কবিসত্তার এক অপরিহার্য অংশ তাঁর মাতৃভাষা। মাতৃভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তো আহরণ করে কবি তাঁর আবেগ অনুভূতির শিল্প সৃষ্টি করেছেন কবিতার আঙ্গিকে। কবিতার মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের যে প্রদীপ তিনি জ্বালিয়েছেন, শত মূল্য দিয়ে মাতৃভাষাই তাকে দান করেছে অমরতা। এ-সূত্রে কবিও মহৎ শিল্পীর পরিচয় গৌরবে সম্মানিত হয়েছেন। কাল ধরে যে ভাষা শিল্পীদের পরিচর্যার মাধ্যমে আজ অবধি সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে সে ভাষার মূল্য ও প্রেরণা কবির সমগ্র সত্তার অংশ। তাঁর অন্তরের অনুভব ভাষার আশ্রয়ে অধরে বিস্তৃত হয়ে শব্দ ও অর্থে পরিণত হয়। এভাবেই মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে কবি আত্মা অনবদ্য প্রতিকৃতি।

প্রশ্ন : 'আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো' – চরণটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বাংলা ভাষার উদ্ভবের রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে যখন বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়, তখন থেকেই এ-ভাষা সমকালীন কবিদের কাব্যচর্চার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

এর পর বিগত বারো শ বছর ধরে কবিদের ভাষা পরিচর্যার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধতর হয়েছে মাতৃভাষা বাংলা। কবি আহসান হাবীবও ভাষার পরিচর্যাকারী কবিসম্প্রদায়ের অংশ যার সমগ্র অস্তিত্বের অংশ হয়ে মাতৃভাষা বাংলার অবস্থান।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।

২। ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো
জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই
অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে,

৩। আজন্ম লালনে তুমি আজীবন সমৃদ্ধ হয়েছো
আছো তুমি সমগ্র সত্তায়;

৪। এই দেশ দেশের মানুষ
মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা
তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই
আমার আত্মা এক অনবদ্য প্রতিমার মতো।

৫। তোমাতেই মূর্ত দেখি সভ্যতার অমর মিনার।

৬। জীবন মুকুর তুমি
কেননা তুমিই এ আত্মা পিপাসার বাণীরূপ।

৪। **এই দেশ দেশের মানুষ**
মানুষের সুখদুঃখ ভালোবাসা
তুমিই করেছো মূর্ত এবং তুমিই
আমার আত্মার এক অনবদ্য প্রতিমার মতো।

উপস্থাপিত স্তবকটি কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে স্বদেশ, দেশের মানুষ ও তাদের জীবন যে ভাষার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে সেই মাতৃভাষার সঙ্গে কবির সম্পর্কের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

হাজার বছরের বাংলাদেশ, দেশের মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা মূর্ত বাংলা ভাষায় কবির কাব্যচর্চা ও সাধনায় স্বদেশ ও মানুষের জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে। ভাষার অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার মধ্য থেকে কবি সাহিত্যিকরা আহরণ করেন মণিমুক্তো। আর এ মণিমুক্তো দিয়ে জাতীয় জীবনের আবেগ ও ব্যক্তিগত অনুভূতিকে তাঁরা শিল্পরূপময় করে তোলেন আহসান হাবীবও মাতৃভাষার সহায়তায় নিজের আবেগ অনুভূতিকে কবিতার আঙ্গিকে সঞ্চার করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আর এভাবেই মাতৃভাষা আহসান হাবীবের কবিসত্তার অনবদ্য প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়েছে। কবির সত্তা ও মাতৃভাষা পরস্পর একীভূত হয়ে কবি আত্মাকে দিয়েছে সম্পর্ণতা।

যিনি প্রকৃত কবি, মাতৃভাষার সহায়তাতেই তিনি অর্জন করেন সাফল্য। মাতৃভাষা যখন কবি আত্মা প্রতিরূপ হয়ে ওঠে, তখনই সাফল্য আসে কবিতায়, কৃতিত্ব অর্জন করেন কবি।

২। **ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো ..... রেখেছো অমর করে।**

কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে আলোচ্য চরণটি চয়ন করা হয়েছে। উদ্ধৃত অংশে বাংলা ভাষার মূল্য ও গৌরব প্রসঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে।

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় গড়ে উঠেছে বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাংলা ভাষাও এ ঐতিহ্যেরই এক অপরিহার্য অংশ। আবহমান বাংলা বাঙালির জীবন-ইতিহাস, তার পতন উত্থান, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা ভাষাশিল্পীর পরিচর্যার হাজার বছরের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অবিমিশ্র স্মারক স্তম্ভ সহস্রাধিক বছর বয়সী বাংলা ভাষা। কেননা বাংলা ভাষাতেই প্রমূর্ত হয়েছে হাজার বছরের বাঙালির সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা স্বপ্ন-সম্ভাবনার ইতিকথা, কবি আহসান হাবীবের বিবেচনায় প্রিয় মাতৃভাষা 'বাংলা' বাঙালি সভ্যতার অমর স্মারক স্তম্ভ।

৬। **জীবন মুকুর তুমি**

কেননা তুমিই এ আত্মার পিপাসার বাণীরূপ।

উদ্ধৃত চরণ দুটি কবি আহসান হাবীব রচিত 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থের "তোমাতে অমর আমি" কবিতার অন্তর্গত। আলোচ্য অংশে কবি মাতৃভাষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূত্র অকপটে উচ্চারণ করেছেন।

মাতৃভাষা বাংলা কবির আত্মজীবনের দর্পণ কবির আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাফল্য-ব্যর্থতা দুঃখ-সুখ, স্বপ্ন-সাফল্য সবকিছুই বিধৃত হয়ে আছে স্বরচিত কবিতায়। ভাষার অকৃপণ সহায়তায় কারণেই কবির পক্ষে কাব্যসৌন্দর্য সৃজনে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। এ-কারণেই কবি ভাষাকে নিজের জীবনের দর্পণ হিসেবে চিহ্নিত করে কবি আত্মার অনন্ত পিপাসার বাণীমূর্তি রূপে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার গৌরবকথায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। কবির অতৃপ্তি ও আকুতি, যাকে ভিন্ন নামে বলা হয় সৃজনবেদনা, তারই প্রেরণায় ও তাগিদে কবি ভাষার আশ্রয়ে সৃষ্টি করেন অনুপম সব কবিতা। ঐ কবিতাবলি সঙ্গত কারণেই হয়ে ওঠে কবির সৃজন পিপাসার বাণীরূপ। ফলত, এ যুক্তিতেই কবি আহসান হাবীবের কাছে মাতৃভাষা বাংলা তাঁর কবি আত্মার বাণীমূর্তি নামে অভিহিত হয়েছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. "তোমাতে অমর আমি" কবিতার মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।
২. কবি জীবনের সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।
৩. মাতৃভাষা প্রসঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।
৪. কবির জীবনে ও সাধনায় মাতৃভাষার প্রভাব ও অবদানের মূল্যায়ন করুন।
৫. "তোমাতে অমর আমি" কবিতার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন : "তোমাতে অমর আমি" কবিতার মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : মাতৃভাষার অস্তিত্ব কবির সমগ্র সত্তায় বিরাজিত। মাতৃভাষা বাংলা কবির জীবনের দর্পণ, তাঁর কবি আত্মার শিল্পসৃজন আকাঙ্ক্ষার বাণীমূর্তি। "তোমাতে অমর আমি" কবিতায় কবি আহসান হাবীবের এ বিশ্বাস শিল্পরূপ লাভ করেছে।

আহাসন হাবীব রচনাবলী-র সম্পাদক আহসান রফিক "তোমাতে অমর আমি" কবিতার বিষয়গৌরব বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন যে, "দেশকালের চৌহদ্দিতে পরিস্ফুট ভালোবাসা নামক বহুমাত্রিক শক্তিমান আবেগ রোমান্টিকতার স্পর্শ সত্ত্বেও সচেতনতার যাত্রায় মুক্তি খোঁজে; যে আবেগ মা, প্রেয়সী ও মাতৃভূমির শৈল্পিক বিক্রিয়ায় একাকার হয়ে

যায়।" কবিতাটির শিল্পসাফল্যের উৎসও কবির চেতনাধারার উল্লিখিত বিক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। জননী, প্রেয়সী এবং দেশমাতাকে একান্ত অনুভবের শৈল্পিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কবির চেতনায় মাতৃভাষার মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কবি শৈশবে মায়ের দুচোখ জুড়ে উৎকণ্ঠা আর স্নেহের তৃষ্ণার অর্থ বুঝতে পারেননি। কবির শিশুচোখ নিষ্পাপ সহজতায় বাসনার সাগরে সাঁতার কেটেছে কেবল। খেলার সামগ্রী তাঁর যতটুকু চেনা, মা ছিলেন তাঁর কাছে ততটুকুই পরিচিত। কিন্তু একসময় মাকে 'মা' বলে ডাকার মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন মায়ের মাধুর্য ও মহিমা। 'মা' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে ধ্বনি ও সুরের মিশ্রিত যে ব্যঞ্জনা তা কবিকে ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন করে তুললো, মা ও ভাষাকে তিনি একই সঙ্গে লাভ করলেন। এরপর কবি যখন যৌবনে উপনীত হয়েছেন তখন প্রিয়ার মুখশ্রীর মধ্যে সন্ধান করছেন সমগ্র পৃথিবীকে। প্রিয়াকে উপহার দিয়েছেন শব্দে উপমায় তৈরি কবিতা। এখানেও মাতৃভাষা কবির প্রিয় সঙ্গী। কবির বিশ্বাস মাতৃভাষাকে আপন করে পেয়েছিলেন বলেই সুন্দর মনের অধিকাররিনী প্রেয়সীকে তিনি পেয়েছেন।

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার উৎস হিসেবেও ভাষার সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন কবি। স্বদেশের নিসর্গলোক অবলম্বন করে কবি অনেক কবিতা লিখেছেন। এজন্যেই অতি সহজেই তিনি বলতে পারেন–

'মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কতা সে সোনার দেমের
আকামে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে।'

সারা জীবনের সাধনায় কবি একান্ত মনে তাঁর ভালোবাসার কথা – নাম প্রিয়া আর মাতৃভূমিকে ভালোবাসার কথা লিখে রেখেছেন। কবির এ ভালোবাসা মূর্ত হয়েছে মাতৃভাষার সম্পদঐশ্বর্য থেকে সংগ্রহ করা মণিমুক্তোর সহায়তায়।

মাতৃভাষাই কবিকে দিয়েছে মহৎ শিল্পীর গৌরব। বাংলা ভাষা তার জন্মলগ্ন থেকেই কবিদের চর্চার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালির জাতিসত্তার অনিবার্য অংশে পরিণত হয়েছে। ভাষার মধ্য দিয়েই প্রমূর্ত হয়েছে হাজার বছরের বাঙালির সুখ-দুঃখময় জীবনের কথা। কবির কাছে প্রিয় মাতৃভাষা তাই তাঁর আত্মা অনবদ্য প্রতিমূর্তি।

বাংলা ভাষা আবহমান বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাসও ঐতিহ্যের স্মারক স্তম্ভে রূপ লাভ করেছে। এ ভাষা কবির জীবনের দর্পণ স্বরূপ। তাঁর আকুতি ও আকাঙ্ক্ষার বাণীমূর্তি প্রিয় 'মাতৃভাষা। কবি লিখেছেন ঃ

জীবন মুকুর তুমি
কেননা তুমিই এ আত্মা পিপাসার বাণীরূপ'

কবির কাছে প্রিয়ার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত কবিতার আর স্নেহময়ী জননীর মুখের কথার অন্য নাম – মাতৃভাষা। কবির অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা, যাকে ভিন্ন নামে বলা যায় সৃজনপিপাসা, তারই অনুপ্রেরণায় ভাষার আশ্রয়ে কবি সৃষ্টি করেন অনুপম সব কবিতা। কবির রচিত কাব্যসম্ভার সঙ্গত কারণেই তাই হয়ে ওঠে তার সৃজনপিপাসার বাণীরূপ। কবিতার উপান্তে এ যুক্তিতেই কবি আহসান হাবীবের কাছে মাতৃভাষা বাংলা তাঁর সত্তার অনিবার্য অংশ হয়ে সৃজনপিপাসু কবি আত্মা বাণীমূর্তি রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রশ্ন : "তোমাতে অমর আমি" কবিতার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মাতৃভাষা 'বাংলা'কে উপলক্ষ করে লিখিত শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির মধ্যে কবি আহসান হাবীবের "তোমাতে অমর আমি" কবিতাখানি অন্যতম। এ কবিতায় যুগপৎ ভাষার রহস্য সন্ধানে কবির শৈশবকালীন ব্যাকুলতা, মাতৃভূমি মা ও প্রেয়সীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক নির্ধারণে কবির দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজের সত্তার প্রতিভূ হয়ে মাতৃভাষা কীভাবে কবিকে শিল্পীর মর্যাদায় মহিমান্বিত করলো, তার শিল্পিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

শৈশবের নিষ্পাপ ও সহজ প্রাথমিক স্তরে ভাষার মূল্য অনাবিষ্কৃত ছিলো কবির কাছে। মাকে 'মা' বলে সম্বোধনের মধ্য দিয়েই কবির ভাষাজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ ঘটে। এভাবেই একই সময়ে একসঙ্গে তিনি মা ও মাতৃভাষাকে নিবিড়ভাবে লাভ করেন। যৌবনে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যখন কাঙ্ক্ষিতা প্রিয়ার মুখশ্রী সন্ধান করেছেন কবি – তখনও তাঁর এ

অন্বেষণ পর্বের কবিতায় মাতৃভাষা বাংলাই ছিলো প্রধান সহায়। উপর্যুক্ত বক্তব্যেই চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে নিচের কবিতাংশে –

'মাকে আর প্রেয়সীকে আর এই দেশকে
আমি ভালোবাসি এই ছোট কথাটি প্রত্যহ
নানা রঙে
এঁকেছি তোমার বিচিত্র রঙের তুলি হাতে নিয়ে।'

বাংলা ভাষা কবির কাব্যচর্চার অবলম্বন এবং কবিসত্তার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। কবি লিখেছেন –

'জীবন মুকুর তুমি
কেননা তুমিই এ আত্মা পিপাসার বাণীরূপ
এবং তুমিই
মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর মুখের কবিতা।'

মাতৃভাষা বাংলা তার জন্মলগ্ন থেকেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার কাব্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং বর্তমান কাল অবধি সৃজনপ্রতিভার পরিচর্যায় সমৃদ্ধতর হয়ে চলেছে। বাংলা ভাষার জন্মের ইতিহাস যেমন সহস্রাধিক বছরের তেমনি বাংলাভাষা চর্চার ইতিহাসও সমান্তরালভাবে তাকে অনুসরণ করেছে। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসও ঐতিহ্যের উপাত্ত ধারণ করে আছে সহস্রাধিক বছর বয়সী এই মাতৃভাষা বাংলা। কবি বাংলাভাষার এ অবদানকে চিহ্নিত করে লিখেছেন :

পাখিদের সব গান সব সুর তার
পথিকের পদচিহ্ন তোমাতেই অমর, এবং
তোমাতেই মূর্ত দেখি সভ্যতার অমর মিনার।

কিন্তু জাতিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়েই কবির ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ হয় না। কবি জানেন তাঁর ব্যক্তিগত কাব্যসাধনায়ও মাতৃভাষা বাংলার রয়েছে এক অমোঘ ভূমিকা। কবি তাঁর রচিত পঙক্তিমালায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের যে আলো প্রজ্জ্বলিত করেছেন তার প্রতিটি শিখাকে অনন্ত জীবন দান করেছে মাতৃভাষা। এ অনির্বাণ শিখাই কবিকে দেবে অমরত্ব, দেবে মহত্তম শিল্পীর মহিমা। মাতৃভাষা বাংলার কাছে কবিঋণ তাই অপরিশোধ্য। কবির ব্যক্তিগত জীবনের অবসান অবধারিত, কিন্তু বেঁচে থাকবে আবহমান বাংলা ও বাঙালি। বাঙালির মুখের ভাষায়, সৃজনশীল প্রতিভার মহিমায় অনন্ত জীবন পাবে বাংলা ভাষা। আর এ ভাষার আশ্রয়েই কবি লাভ করবেন কাঙ্ক্ষিত অমরতা। কবির ভাষায়–

'ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো
জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে, যার প্রতি শিখায় তুমিই
অনন্ত জীবন দিয়ে রেখেছো অমর করে, আর
আমাকে দিয়েছো এক মহত্তম শিল্পীর মহিমা।'

কবির ঘোষণার মধ্যেই নিহিত আছে "তোমাতে অমর আমি" কবিতার নামকরণের তাৎপর্য। নির্দ্বিধায় তাই বলা যায়, কবিতাখানির "তোমাতে অমর আমি" শিরোনাম সমগ্র কবিতার অনুষঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সার্থক।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

বিরামচিহ্ন : লিখিত বাক্যে বিরাম বা ছেদ নির্দেশ করার জন্য যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণ নাম **বিরাম চিহ্ন** বা **ছেদ চিহ্ন**। "তোমাতে অমর আমি" কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দু'ধরনের **বিরাম চিহ্ন** ব্যাখ্যা করা হলো।

ক) 'মায়ের দু'চোখে শুধু তৃষ্ণা আর সারা মুখে তার
কি গভীর ব্যাকুলতা বুঝিনি!

– দ্বিতীয় চরণের শেষে স্থাপিত! এ প্রান্তিক বিরামচিহ্নকে বলা হয় **বিস্ময়চিহ্ন**। সাধারণত বিস্ময়, আনন্দ, ভয়, ক্ষোভ, প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করার জন্য **বিস্ময়চিহ্ন** ব্যবহার করা হয়।

খ) আমার
শিশুচোখে নিষ্পাপ মূঢ়তা;
কেবল অনন্যমনে স্তব্ধতার সমুদ্র-সাঁতার।

– উপর্যুক্ত তিনটি চরণের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় চরণের বিরামচিহ্নটির (;) নাম **সেমিকোলন** বা **অর্ধচ্ছেদ**। সেমিকোলন সর্বদা বাক্যের ভেতরে ব্যবহার করা হয়। বিরামকাল সেখানে **কমা**-র চেয়ে বেশি, কিন্তু দাঁড়ি-র চেয়ে কম, এমন স্থানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়।

বিশেষ্য ও বিশেষণ

যে **পদ** কোনো কিছুর নাম প্রকাশ করে তা-ই **বিশেষ্য** বা **নামপদ**

বাক্যস্থিত কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে **বিশেষণ** বলে। **বিশেষণ** অন্য পদকে বিশেষিত করে।

– "তোমাতে অমর আমি" কবিতায় ব্যবহৃত কিছু **বিশেষ্যপদ**-এর **বিশেষণ**–রূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

বিশেষ্য	**বিশেষণ**
তৃষ্ণা	তৃষ্ণার্ত
ব্যাকুলতা	ব্যাকুল
মূঢ়তা	মূঢ়
মাধুরী	মধুর
পিপাসা	পিপাসিত/পিপাসী

প্রতিশব্দ : যে-সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে অথবা যে-সব শব্দকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়, তাদের বলা হয় **প্রতিশব্দ** বা **সমার্থক শব্দ**।

বর্তমান কবিতা থেকে কিছু শব্দ এবং সেগুলির কিছু প্রতিশব্দ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

মূল শব্দ	**প্রতিশব্দ/সমার্থক শব্দ**
গভীর	অথই, অতল, অনন্ততর, গহীন, নিস্তল

সুন্দর	চমৎকার, অনবদ্য, অপরূপ, শোভন
আকাশ	গগন, অম্বর, আশমান, নভঃ, ব্যোম
অরণ্য	বন, অরণ্যানী, অটবী, বনস্থল, বিপিন, জঙ্গল
সমুদ্র	সাগর, সায়র, সিন্ধু, দরিয়া, পারাবার, অর্ণব, জলধি

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

সংকলিত কবিতা থেকে বিশেষণ পদের তালিকা প্রস্তুত করে এগুলিকে বিশেষ্য পদে রূপান্তর করুন। প্রয়োজনে অভিধান-এর সাহায্য নিন।

'মহান ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব' বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

বাংলা ভাষাকে উপলক্ষ করে লেখা পাঁচটি বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম কবির নাম-সহ লিখুন।

প্রাচীন বাংলা-য় কবিতা লিখেছেন এমন পাঁচজন কবির নাম সংগ্রহ করুন এবং লিখে রাখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

আহসান হাবীব রচনাবলী : প্রথম খণ্ড : আহমদ রফিক সম্পাদিত

অনন্য স্বদেশ

হাসান হাফিজুর রহমান

কবি পরিচিতি

কবি হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ জুন নানার বাড়ী জামালপুরে জন্ম করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহমান ও মাতার নাম হাফিজা খাতুন। পিতা শিক্ষাবিভাগে চাকুরি করতেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় পিতার সঙ্গে ঢাকাতেই কেটেছে।

১৯৪৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯৪৮ এ ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্পৃক্ততা পরবর্তীতে কবির সাহিত্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে কেবল অংশগ্রহণই নয়, সেই সঙ্গে কর্মী এবং সংগঠক হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৬২ সালে কবি জগন্নাথ কলেজে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের মনে মনোবল যুগিয়েছেন। ১৯৭৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প-এর প্রধান হন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৮২ সালে ষোল খণ্ডে পরিকল্পিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' সংকলনের কাজ শেষ হয়। এ কাজ করার সময়ই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য মস্কোতে পাঠান হয়। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল কবির কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় নিজের মনের দ্বন্দ্ব জটিলতার চেয়ে সময় এবং সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণার প্রকাশ বেশি। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর বহু কবিতায় প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মত হতাশা নয়, বরং সম্ভাবনাময় আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য চেতনার মূলে রয়েছে বাঙালি জীবনের সমগ্রতায় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

কবির উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭১), বজ্রে চেরা আঁধার আমার ১৯৭৬), শোকার্ত তরবারি (১৯৮১)।

গল্পগ্রন্থ : আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭১), হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত গল্প (১৯৭০)

প্রবন্ধ ও সমালোচনা : আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূল্যবোধের জন্য (১৯৭০) সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩)।

অনুবাদ : হোমার : ওডেসী (১৯৮৭)

ভূমিকা

হাসান হাফিজুর রহমানের 'অনন্য স্বদেশ' কবিতাটি 'আর্ত শব্দাবলী' (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এটি একটি দেশপ্রবোধক কবিতা। হাসান হাফিজুর রহমানের এ কবিতায় দেশপ্রেম একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখানে দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা নয়, মাতৃভূমির অস্তিত্বের সঙ্গে আপন অস্তিত্বের একাত্মতা বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মৃত্তিকার সুবাস, জনজীবনের ধারাবাহিক ঐতিহ্য সবই কবির কাছে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। অনন্য স্বদেশ একটি গদ্য কবিতা।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. গদ্য কবিতার আঙ্গিক কেমন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. কবির দেশ প্রেমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কবি দেশের কাছে কী সমর্পণ করতে চান তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দেশের সঙ্গে কবির একাত্মার অনুভূতির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ/টীকা	মূলপাঠ
অনন্য – অদ্বিতীয়, একক।	আমার হৃদপিণ্ডকে আমি উপড়িয়ে আনতে পারিনে,
স্বদেশ – নিজের দেশ, জন্মভূমি।	কিন্তু পারি সমগ্র অস্তিত্বকে সমর্পণ করতে;
হৃৎপিণ্ড – হৃদয়। এখানে আমাদের রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।	আমার সত্তাকে আমি পারি নে দেখাতে
উপড়িয়ে – টেনে তুলে আনা।	কিন্তু পারি আমার আশা–বাসনার
অস্তিত্ব – বিদ্যমানতা, স্থিতি, সমগ্র অস্তিত্ব, এখানে দৈহিক ও মানসিক দুটোসহ পরিপূর্ণ মানুষ।	রঞ্জিত ফুল স্পন্দিত ধ্বনিতে ফোটাতে;
সমর্পণ – অর্পণ করা, দান করা।	আমার দেহের শিরা–উপশিরাকে আমি জানি নে
সত্তা – বিদ্যমানতা, নিত্যতা, উৎপত্তি, শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ, সাধুতা। এখানে অস্তিত্বকেই বোঝানো হয়েছে।	কিন্তু জানি আমার দেহকে–
বাসনা – কামনা, ইচ্ছা।	ব্যথা-আনন্দ-সুখ, তৃষ্ণা-ঘৃণা-পুঞ্জিত
রঞ্জিত – রঙিন, রঙ করা হয়েছে, চিত্রিত।	সুগভীর ত্বকের সীমানা,
স্পন্দিত – রক্ত সঞ্চালন করে যেসব ধমনী বা নাড়ী।	প্রখর প্রবল ইন্দ্রিয়ের সত্যকে
পুঞ্জিত – এক জায়গায় সঞ্চিত।	আমার হৃৎপিণ্ডের মতো
সুগভীর – অনেক গভীর।	আমার সত্তার মতো
ত্বক – গায়ের চামড়া।	আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মতো
প্রখর – কড়া, তীব্র।	সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ
প্রবল – প্রচণ্ড, তীব্র, বলশালী।	আমার দেহের আনন্দ কান্নায় তোমাতেই আমি সমর্পিত
ইন্দ্রিয় – যে সকল দেহ-যন্ত্র বা শক্তি দ্বারা কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও বিভিন্ন কাজ করার সামর্থ জন্মে। ইন্দ্রিয় চৌদ্দটি। যথা- বাক, পাণি, পাদ, পায়ু,	পল্লবে আর ধূলিতে পলিতে রয়েছি মিশে
	পর্বতে আর মরুতে নদীতে গমের শীষে
	ধন্য ধানের পুষ্পিত সুধাগন্ধভারে
	অযুত যোজন বন্ধনগাঢ় নীলিমা পারে
	এক হাওয়া মাখি মুগ্ধনয়ন দেহের তীরে
	যতদূরে যাই তোমাতেই ফের আসি যে ফিরে।

উপস্থ- ৫টি কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক - ৫টি জ্ঞানোন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, **চিত্ত** – এই ৪টি অন্তরিন্দ্রিয়। **স্নায়ুতন্ত্রী** – দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীকে বলে স্নায়ু। সমস্ত দেহে সুতার মতো এ স্নায়ু জালের মত সমস্ত দেহে ছড়িয়ে আছে। যে কোন অঙ্গ কর্তৃক যে অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয় তা দ্রুত মস্তিস্কে এ স্নায়ু পৌঁছে দেয়। **সর্বক্ষণ** – সব সময়। **পল্লব** – বৃক্ষের নতুন কচিপাতা, নতুন পাতাযুক্ত ডালের অগ্রভাগ, **অযুত** – দশ হাজার। **যোজন** – এক অর্থে একত্র করা, সঙ্ঘটন, চারক্রোশ বা আট/নয় মাইলের মতো দূরত্ব। **শীষ** – অগ্রভাগ। **নীলিমা** – আকাশ (নীল+ইমন) বা নীলবর্ণ। **বন্ধনগাঢ়** – নিবিড়ভাবে সংবদ্ধ।	

ভাবসংক্ষেপ

কবি আপন হৃৎপিণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে স্বদেশের কাছে সমর্পণ করতে পারবেন। কবি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কথার মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারেন। দেহের ভেতরের অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্রীকে দেখতে পাওয়া যায় না সত্যি, কিন্তু দেহে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে তা আমরা জানি। সেই অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মত স্বদেশ প্রতি মুহূর্তে কবির কাছে সত্য। এ দেহেই রয়েছে সুখ দুঃখ, আনন্দ,, বেদনা ঘৃণা, সব কিছু। ইন্দ্রিয় লব্ধ সব কিছুই কবি স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে চান। স্বদেশের পত্র-পল্লবে, ধুলিতে, মাটিতে, নদীতে, গমের শীষে, পুষ্পিত শস্যের সুবাসে, আকাশের নীলে, হাওয়ার মাঝে কবি যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে আছেন। যতই দেখেন স্বদেশের সৌন্দর্যে আপ্লুত কবির মুগ্ধতা যেন কাটতে চায়না। তাই দেশ ছেড়ে যত দূরেই তিনি যান না কেন, আবার স্বদেশের কোলেই ফিরে আসতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কবি স্বদেশের কাছে কী সমর্পণ করতে চান?

উত্তর : পঞ্চাশের দশকের অনন্য কবি হাসান হাফিজুর রহমান 'অনন্য স্বদেশ' কবিতায় স্বদেশ সম্পর্কিত ভাবনাকে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। বাংলা কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত থেকেই স্বদেশ চিন্তা স্থান পেয়েছে। কিন্তু কবি হাসান হাফিজুর রহমানের দেশপ্রেমের মাঝে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে তিনি স্বদেশকে একাকার করে ফেলেছেন। কিন্তু তার পরও কবির মনে অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে। এমনি করেই স্বদেশ সম্পর্কে কবির অনন্য উপলব্ধির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে।

কবি তাঁর হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনতে পারেন না, কারণ দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে স্বদেশের কাছে সমর্পণ করতে চান। নিজের সত্তাকে কেউ অন্যকে দেখাতে পারে না সত্য, কিন্তু কামনা বাসনাকে রঙিন ফুলের মত কথার মালায় সাজিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। দেহের শিরা উপশিরাকে আমরা বাইরে থেকে চোখে দেখিনা, কিন্তু দেহকে সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। দেহের ভেতরের ব্যথা-বেদনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঘৃণা-আনন্দ মিশ্রিত সমস্ত অনুভূতি নিয়েই কবির সত্তা।

দেহের ইন্দ্রিয় লব্ধ সমস্ত অনুভূতি, হৃৎপিণ্ডের চলমান সত্তার অজানা, অদেখা স্নায়ুতন্ত্রীকে কবি যেমন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, দেশকেও ঠিক তেমনি পরম সত্যের মত প্রতি মুহূর্তে নিজের মধ্যে অনুভব করেন। কবি তাই তাঁর দেহের অভ্যন্তরে জাত সর্ববিধ আনন্দ-বেদনা, সুখ-সুঃখ স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন।

২. দেশের সঙ্গে কবির একাত্মার অনুভূতি বর্ণনা করুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দেশের প্রতি কবির আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ	শব্দার্থ/টীকা
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ – আকাশে উড়ন্ত পাখি। **নীড়** – পাখির বাসা। **স্বাদ** – জিহ্বায় খাদ্য পানীয়ের গুণাগুণ বোধ। **তৃপ্তি** – তৃষ্ণার নিবৃত্তি। **শিকড় বিহীন** – অবলম্বনহীন, ত্রিশংকু অবস্থা। **পূর্বপুরুষ** – পুরুষ পরম্পরায় যা গড়ে ওঠে। **কুটির** – কুঁড়েঘর। **মাটির সুধা** – মাটির রস। **রসনা** – আস্বাদনের ইন্দ্রিয়, জিহ্বা। **শয্যা** – বিছানা, যেখানে ঘুমানো হয়। **তনুমন** – দেহ ও মন। **বদলে** – বিনিময়ে।	যদি জানতাম তোমাকে ফেলে যাওয়া যায় যদি জানতাম তোমার ফেলে যাওয়া যায় যদি জানতাম তোমার আহত মাটির কঠিন ব্যথা আমার দেহে লাগে না, কোন্ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো নীড়হীন শূন্যতায় আমি উড়তাম তবে? যদি জানতাম পৃথিবীর সমগ্র আকাশে সব ঠাঁই একই নিশ্বাসের বায়ু প্রবাহিত, সব ফলে এক স্বাদ সব ফুলে এক ঘ্রাণ, সব ফসলে একই তৃপ্তি, আমি কোন্ সব-যাওয়া আনন্দে শিকড়-বিহীন নিরাবলম্ব ভাসতাম তবে? কে জানত আমার নাম, আমার পূর্বপুরুষের পরিচয়, আমার গায়ে কোন্ মাটির রঙ? আমি কেন কাঁদি, কেন খুশি হই, মায়ের হাতলাগা কোন্ কুটিরের দিকে আমার তনুমন ফিরে চায়? কে জানত? তোমার হাওয়া ছাড়া আমার নিশ্বাসে তৃপ্তি নেই, তোমার মাটির সুধা ছাড়া আমার রসনায় স্বাদ নেই, তোমার বুকের শয্যা ছাড়া আমার প্রাণের মুক্তি নেই,

	এত দিয়েছ তুমি আমাকে, বদলে তার কিছুই দিতে পারিনে, আমি, শুধু দিতে পারি আমার ওপরে তোমার অধিকার।

ভাবসংক্ষেপ

স্বদেশের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণেই কবি মুক্ত পাখির মত নীড়হীন হয়েছেন। পৃথিবীর সব জায়গায়ই রয়েছে শস্যের মাঠ, ফল ও ফুলের বাগান, বইছে নিঃশ্বাসের বায়ু, কিন্তু নিজের দেশের ফুলের সুবাস, ফলের স্বাদ, নিঃশ্বাসের বায়ুর মত আর কোথাও পাওয়া যায় না। নতুবা কবি নিরাবলম্ব ত্রিশংকু অবস্থায় ভাসমান থাকতেন। তাহলে কবির ঐতিহ্য বলতে কিছু থাকতোনা। এমন মায়ের আদর পাওয়ার আকর্ষণে নিজের কুটিরের দিকে আসতে হয় বারবার। মায়ের বুকে শিশুর যেমন তৃপ্তি, কবিরও তেমনি দেশের আলো-হাওয়া, মাটির সুধায়, এ মাটিতে শয্যাগ্রহণে সমান তৃপ্তি। যে দেশ কবিকে এত কিছু দিয়েছে, তার বিনিময়ে তিনি তার সমস্ত অস্তিত্বের উপর সর্বাত্মক অধিকার ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. "সমগ্র আকাশে সব ঠাঁই একই নিঃশ্বাসের বায়ু প্রবাহিত।" বাক্যটি কোন প্রসঙ্গে কেন ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তর : পঞ্চাশের দশকে কবি হাসান হাফিজুর রহমান "অনন্য স্বদেশ" কবিতায় তাঁর স্বদেশের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে চরণটি ব্যবহার করেছেন।

কবি যদি এরকম পারতেন যে দেশ ছেড়ে যে কোন সময় চলে গেলে তাঁর কোন পশ্চাৎ আকর্ষণ থাকবে না; বা এ দেশের অপমানে, পরাভবে, বেদনায় তাঁর হৃদয়ও অপমানে, আঘাতে আলোড়িত, বেদনার্ত হয়না; তাহলে আকাশে পাখির মত ডানা মেলে উড়ে বেড়াতেন, শূন্যতায় ভেসে বেড়াতেন, নীড়ের সন্ধান না করে ত্রিশঙ্কুর মতো ভাসমান অবস্থায় থাকতেন।

পৃথিবীর সব জায়গায় আলো আছে, নিশ্বাসের জন্য খোলা বাতাস রয়েছে, অবারিত ফসলের ক্ষেত রয়েছে, সুস্বাদু ফল আছে, পুষ্পিত ফুলের সুবাস রয়েছে। কিন্তু কবি অনুভব করেন স্বদেশের আকাশের নীল, নিজের দেশের ফলের স্বাদ, ফুলের সুবাস, ফসলের তৃপ্তি, বাতাসের নিশ্বাস নেবার আনন্দ অন্য কোথাও নেই। স্বদেশ ছাড়া কবির অবস্থা মূল্যহীন, নিরাবলম্ব ত্রিশঙ্কুর ভাসমান অবস্থায় থাকার মতো হয়ে পড়ত। অর্থাৎ কবির নিজের কোন অস্তিত্বই আর থাকতোনা বলে কবির এ অকৃত্রিম আকর্ষণের কারণটি আমাদের কাছে স্বচ্ছ করে তোলার জন্যেই আশ্চর্য সুন্দর চরণটি ব্যবহার করেছেন।

২। "কে জানত আমার নাম আমার পূর্ব পুরুষের পরিচয়" উক্তিটি বুঝিয়ে লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। 'অনন্য স্বদেশ' কবিতাটি অবলম্বনে কবির স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিন।

আরও যা পড়তে পারেন

হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্য ও গদ্যগ্রন্থসমূহ।